বিষয়: কোভিড পরিস্থিতি এবং জীবনের নতুন লিখন

"আমার ঘর আমার পা'কে বিশ্বাস করে না"

কথাবার্তায় সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ও মধুরিমা দত্ত

আশা আর আশঙ্কার মধ্যে এই পেন্ডুলাম সময়। অতিথির মতো আমরা তাকে দেখছি। সময়ের ঘরবাড়ি এখন সময় নিজেই মেরামত করছে। অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কীই বা করার আছে আমাদের! সোয়েটার বোনার মতো আমরা এখন পরম ধৈর্য্য নিয়ে মাপ নিচ্ছি আবার উল্টোদিকে উল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি নতুন করে চেষ্টা করা যায় কী না। একেই এখন আমরা লড়াই বলে ডাকছি। ডাকছি, শোনো সময়, আমরা হারতে জানিনি আজও। সব কিছু থেমে গেলেও সেই বৃদ্ধ মানুষটি থাকবেন harrowing the clod.. পৃথিবীকে বাসযোগ্য আর চাষযোগ্য করার জন্য তাঁরাই আবার নিয়ে আসবেন এক আশ্চর্য কোকিল। আর এই ভাঙাগড়ার খেলার যিনি একনিষ্ঠ দর্শক তিনিই তো এই সময়ের লেখক। তিনিই তো সময়ের অনুবাদক। তাই আলোচনায় সঙ্গে ছিলেন সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

মধুরিমা : এই লকডাউনে আপনি আছেন কেমন? আপনার লেখালেখি, রোজের যাপন কীভাবে চলছে?

স্বপ্নময় : এমন অবস্থার কথা তো কেউ ভাবিনি। আমার বাপ ঠাকুর্দাও এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছেন কিনা জানি না। হ্যাঁ, কলেরা মহামারীর কথা শুনেছিলাম। সেই মহামারীতে এক একটা পাড়া থেকে বেশ কিছু মানুষ মারা যেতেন। স্কুলে কলেরার টিকা দিতে আসত। কিন্তু কলেরা মানুষে মানুষে এমন তফাত করে দেয়নি। মানুষে মানুষে এমন অবিশ্বাস এনে দেয়নি। আমার মুখ আমার হাতকে বিশ্বাস করে না। আমার বাঁ হাত আমার ডান হাতকে বিশ্বাস করে না। আমার মুখ আমারই দেহের অন্য অংশকে বিশ্বাস করে না। আমার পা যখন ঘরে প্রবেশ করে আমার ঘর আমার পা'কে বিশ্বাস করে না এই ভেবে যে আমি পায়ে করে ঘরে কিছু নিয়ে এলাম কিনা। যে ভাইরাসকে আমরা চিনি না, তার স্বভাব চরিত্র কিছুই জানি না.... সে এমন ভেদাভেদ করে দিল।

মধুরিমা : আর পরিকাঠামোও তো....

স্বপ্নময় : আমার কিছু চিকিৎসক বন্ধুরা বলছেন তাঁরা সব রোগীর স্যালাইভা টেস্ট করাতেও বলতে পারছেন না, বেসরকারি হাসপাতালে ৪৭০০ টাকা দিয়ে

টেস্ট করানো কি সম্ভব সবার? আর কেবল কলকাতাতেই যা সংক্রমণ সরকারি হাসপাতালে সেই পরীক্ষা করাতে গেলে কত বড় লাইন পড়বে! আমি এমনও জানি, করোনাতেই মারা গেছেন, আমার চিকিৎসক বন্ধুরা বলেছেন, কিন্তু করোনার কথা উল্লেখ না করেই ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে মৃত্যু পরবর্তী সমস্যার কথা ভেবে। চারদিকে এত অস্পৃশ্যতা তৈরি হয়েছে। 'মানুষ মানুষের জন্য....' এটাই তো মানুষের সমাজবদ্ধ থাকার মূল জায়গা ছিল। সংকটে মানুষের পাশে থাকতে হবে এটাই তো আমাদের প্রবৃত্তি, এটা তো জিনে আছে। এতদিনের এই অভ্যাস পালটে গেছে করোনায়। আমরা আর একসাথে থাকব না, সভা করব না, একে অন্যের বাড়ি যাব না। আমার করোনা আক্রান্ত বন্ধুকে আমি দেখতে না গেলে তা দোষের হবে না। অথচ এইডস বা ক্যান্সার আক্রান্তদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। গল্প করেছি পাশে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছি। কিন্তু এ এমন এক রোগ যা বলে দিল, 'যেও না। যাওয়াটাই খারাপ।' তাহলে ভালো তো নেই আমরা, বেঁচে আছি মাত্র।

মধুরিমা : আপনি অস্পৃশ্যতার কথা বললেন। সত্যিই আমরা এই সময়টা কেউ দেখিনি। প্লেগ দেখিনি, স্প্যানিশ ফ্লুও না...

স্বপ্নময় : হ্যাঁ স্প্যানিশ ফ্লু আমরাও দেখিনি। তবে হ্যাঁ কলেরা দেখেছি, গুটি বসন্ত দেখিনি কিন্তু স্মলপক্স দেখেছি। এখনও বহু মানুষের মুখে সে ছাপ রয়ে গেছে। আমরা শুনেছি কেবল, দেখিনি। কলেরার ছোট সংস্করণ আন্ত্রিক হয় এখন। তবে সেসব অত মারাত্মক নয়। আসলে করোনাও তত মারাত্মক নয়। তবে যে ভয়ের আবহে আছি তা ভয়াবহ। একসঙ্গে যদি অনেক মানুষ অসুস্থ হন, তার ৫ শতাংশ মানুষেরও যদি অক্সিজেন বা ভেন্টিলেশন দরকার হয়, আমরা সেটুকুও দিতে পারব না।

মধুরিমা : শুধুমাত্র অসুখটুকু তো নয়। প্রথমে লকডাউন শুরু হল। ১৫ দিনের গৃহবন্দিত্ব। তারপর প্রায় দু' তিন মাসের লকডাউন। তারপর আবার আনলক শুরু হল, আবার স্থানীয় লকডাউন। এর মাঝে প্রচুর প্রচুর মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছেন, প্রচুর মানুষ বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন। আবার অনেক মানুষ অন্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এ তো কেবল করোনা ভাইরাস রোগের ভয় নয়। সামগ্রিকভাবে সমাজের উপরেও তো এই রোগের অদ্ভুত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া চোখে পড়ছে।

স্বপ্নময় : এটা ব্যাখ্যা করার উপর নির্ভর করছে যে কীভাবে দেখছি। সংক্রমণের গোড়ার দিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বললেন ডাক্তার নার্সদের সম্বর্ধনা দিন, আলোর আরতি করুন। প্রদীপ না পারলে মোবাইলের আলো জ্বালান, থালা বাজান, কাঁসর ঘণ্টা বাজান। এবার মনে করুন, একটা ফ্ল্যাটবাড়ি যেখানে ৪০ জন থাকেন। ফ্ল্যাটে প্রথম প্রথম সবাই ভাই-ভাই থাকেন। একটু পিকনিক হয়, জন্মদিনে গণ হাততালি হয়। আস্তে আস্তে নানা মতভেদ আসে। কালীপুজোয় কেউ বোমা ফাটালে বোমাপ্রেমী বনাম পরিবেশপ্রেমীর ঝগড়া হয়ে যায়। থালা বাজানো নিয়েও মতভেদ থাকবে। তখন একদল অন্যদলকে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেবে। যারা তিন সপ্তাহ আগে থালা বাজালেন বা বাজালেন না, তারাই ওই ফ্ল্যাটে যদি তিন জন নার্স থাকেন তাহলে সিদ্ধান্তও নেবেন যে নার্সরা কোভিড ছড়াবেন, ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। ব্যাস সবাই আবার একজোট হয়ে গেল। সবাই একমত হলেন, 'নার্সদের বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ'। এই তো দেখছি, হাসির ছলেই দেখছি। এভাবেই লিখি আমি। আবার এমনও হতে পারে কেউ এগিয়ে এলেন, এসে বললেন, 'আপনারা এমন ভণ্ড! কিছুদিন আগে থালা বাজালেন এখন ঢুকতে দিচ্ছেন না! আপনারা ক্ষমা চান....' এমনটা হলে আরেকটা নতুন গল্প জন্ম নেবে।

মধুরিমা : করোনা পরিস্থিতি তো গল্পের আকর....

স্বপ্নময় : দেখুন না, রাস্তায় মুখোশ পরে আড়ালে থাকছি। সামনের জন বুঝতেও পারছে না ও আমাকে দেখে বিরক্ত হল নাকি মুচকি হাসল। ভাবছে, রাস্তায় দেখা হলেই তো ভ্যাজর ভ্যাজর করবে আর করোনা ছড়াবে। আমরা তো জানিই না কে করোনাবাহী। এমনিতেই আমরা সবাই মুখোশধারীই ছিলাম, আবার উপরি একটা মুখোশ পরেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মদন তাঁতি ফাঁকা তাঁত খটাখট করে বুনছিল। আসলে ওটা তো মদন তাঁতির অভ্যাস, তাঁর সংগ্রামের অভ্যাস। এই একুশ দিনের লকডাউন যখন চলছিল দেখতাম রাস্তার কুকুরগুলো বিভ্রান্ত! ওরা বোধহয় ভাবত কী দিন পড়ল রে বাবা, চাটার জন্য একটা শালপাতাও পাচ্ছি না! আমি একজন রিকশাওয়ালাকে দেখেছি। ফাঁকা রিকশার সিটে একরাশ শূন্যতা বহন করে রিকশা চালাচ্ছেন। আমি বুঝেছিলাম ইনি হলেন সেই মদন তাঁতি। একা একা রিকশা চালাচ্ছেন, চালানোর

অভ্যাসে। একজন লোককে দেখেছি আপন মনে উপরের দিকে তাকিয়ে হাঁটছেন। একদিন তার মুখে শুনেছিলাম, "এই গাছের ডালটা শক্ত।" মানে এই ডালে ঝুলে পড়া যায়। কত কত মানুষ এই সময়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন। তাদের সামনে উপায় নেই আর। খাদ্যের সংস্থান হওয়াতে কিছুটা সুবিধা হয়েছে, কিন্তু যিশুখ্রিস্ট একটা অমূল্য কথা বলেছিলেন, Not by bread alone... কেবল রুটি দিয়ে তো বাঁচা যায় না। হয়তো অভুক্ত কেউ নেই এখন কিন্তু এভাবে বাঁচা! কাজ নেই, ভবিষ্যৎ নেই, বন্দিশিবিরে থাকা! এই অনিশ্চয়তা কবে সরবে জানা নেই। মৃত্যুকে অতখানি ভয় নেই। কিন্তু আমাদের চিকিৎসা পরিকাঠামোও তো ভালো না। পিপিই কিটের দাম বা চিকিৎসকের ফিজ বেঁধে দিলেই তো হল না। বেসরকারি হাসপাতালগুলো তো আর এভাবে টাকা নেয় না। একজন কোভিড রোগীকে ভর্তি করালে কমপক্ষে সাত লাখ টাকা বিল ধরাবেই বেঁচে ফিরলে। ভেন্টিলেশন হলে কত হবে জানা নেই। সরকারি হাসপাতালে সমস্ত বেড ভরে গেলে মানুষ যাবেটা কোথায়?

: আপনি যে চরিত্রগুলোর কথা বললেন, সে কুকুর হোক বা রিকশাওয়ালা, লেখক কোথাও হয়তো চরিত্রকে দিয়ে দর্শনের কথা বলাতে চাইলেন আবার কোথাও হয়তো সামাজিক যে পরিস্থিতি, সমস্যা, যার মোকাবিলা সম্ভব তার একটা দিশা দেখাতে চাইলেন। কোথাও তিনি দার্শনিক কোথাও আবার অ্যাক্টিভিস্ট। এই সময়ের প্রেক্ষিতে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী নিজকে ঠিক কোন জায়গায় রাখবেন, দার্শনিক নাকি অ্যাক্টিভিস্ট?

: মহাশ্বেতা দেবীকে আমরা দেখেছিলাম অ্যাক্টিভিস্ট। সুনীল গাঙ্গুলি কিছুদিন বাংলাভাষার জন্য আন্দোলন করেন। লেখকদের মধ্যে অ্যাক্টিভিস্ট কম দেখেছি। সতীনাথ ভাদুড়ি কংগ্রেস করতেন এবং তাঁর অ্যাক্টিভিজম তিনি জাগরী, ঢোঁড়াই চরিত মানসে দেখিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, কতখানি মিছিল করেছেন বা পোস্টার মেরেছেন সে বিষয়ে জানি না কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে দেখেছি। বীরেন ভট্টাচার্যকে দেখেছি, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় দেখেছি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিছুকাল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থাকলেও পরে তা ত্যাগ করেন। কিছু লেখক

রাস্তায় নেমে কাজ করেছেন, খুব বেশি নেই। পৃথিবীতে আছে। নেরুদা, লোরকা, আমাদের এখানে নেই। অনেক সময় লিখে কী হবে, আমি অমুক পুরস্কার পাব কিনা, এটা লিখলে আমার বঙ্গভূষণটা কী হবে? এসব ভেবেই লিখি না। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে মানুষ ভালোবাসে খুব। কেউ মৎসপ্রেমী, কেউ মাংসপ্রেমী, কেউ মদ্যপ্রেমী, তেমন কেউ কেউ ক্ষমতাপ্রেমীও হয়। তাদের লেখালেখির মধ্যে অঙ্ক থাকে।

দর্শনের কথায় আসি। আমাদের যে ছ'খানা দর্শন, তাতে ধর্মের কথা বলা আছে বারবার। বলা হচ্ছে, এসো আমরা দরকারি কথা বলি। তারপর বলছে ধর্ম নিয়ে কথা বলি। রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধের কথা এল। তারপর বলল পদার্থগুলো কেউ সমধর্ম বিশিষ্ট কেউ কেউ পৃথকধর্ম বিশিষ্ট। এই ধর্ম মানে তো প্রপার্টি! জলের ধর্ম, সোনার ধর্ম, কাঁচের ধর্ম-সব প্রপার্টি। কেউ বলেন, ধর্ম মানে তাই যা ধারণ করে রাখে। কিন্তু পদার্থবিদ্যায় তা প্রপার্টি। মানুষের ধর্ম কী? মানুষের প্রধান ধর্ম 'মানুষ মানুষের জন্য'। মানুষ কিছু এথিক্স ধারণ করে। 'না চাহিতে মোরে যা করেছ দান, আকাশ, আলো, তনু, মন, প্রাণ, দিনে দিনে তুমি নিতেছ মোরে সে দানের যোগ্য করে'... যা পেয়েছি, আমরা সবাই ভাগ করে নেব, এটাই ধর্ম। আমি একাই যদি ভোগ করি আর সেটাই যদি নিয়ম হয়ে যায় তাহলে মুশকিল। একা ভোগ, একা সঞ্চয়- এখানেই মানুষ ধর্মচ্যুত হল এবং এর শাস্তি নেই। আরও খারাপ হল যে মানুষ এগুলোকে সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট বলে জাস্টিফাই করছে। লেখকের দর্শন হল ধর্মে তিষ্ঠ থাকা। মানুষের অর্জিত ধর্মে তিষ্ঠ থাকা। তাহলে আমি একজন অ্যাক্টিভিস্টও, কারণ আমি যা বিশ্বাস করি তা বলার চেষ্টা করি। আবার, একজন দার্শনিকও। আমি কি র‍্যাঁবোকে, নেরুদাকে, যামিনী রায়কে দার্শনিক বলব না?

মধুরিমা : বিশ্বযুদ্ধ হোক বা মন্বন্তর- আমরা দেখিনি। আমরা যে ঘটনাগুলো দেখিনি তার কথা জেনেছি সাহিত্যের হাত ধরে। যে কোনও বড় ঘটনারই তো প্রত্যক্ষ অভিঘাত আসে সাহিত্যের উপরে। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে সেই সময়টাকে জানতে পারি। ১৩৫০ এর মন্বন্তর, রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে ছাপ ফেলেছিল, সেই সময়ের লঙ্গরখানা আর বর্তমানের কমিউনিটি কিচেন। আপনি এই পৃথক সময়গুলোকে কীভাবে দেখছেন?

স্বপ্নময় : যুদ্ধ নিয়ে, মহামারী নিয়ে আমাদের সাহিত্য তেমন নেই। মারী অনেকবার হয়েছে। শ্রীকান্তে, শরদিন্দুর লেখায় উল্লেখ আছে। রবি ঠাকুরের ছোটোগল্পে, জীবনস্মৃতিতে ডেঙ্গির উল্লেখ আছে। সেই সময় তিন দিনের বা চার দিনের জ্বরে মৃত্যুর প্রচুর উল্লেখ আছে। প্লেগ নিয়ে শরৎচন্দ্রের লেখা আছে। নিবেদিতার লেখাতেও উল্লেখ আছে। আবার প্রাচীন সাহিত্যে কুষ্ঠের উল্লেখ আছে। নীরোদ সি চৌধুরীর একটা লেখার কথা অনেকেই জানেন না, মীরজাফরের কুষ্ঠ হয়েছিল। কুষ্ঠে গলিত দেহ নিয়ে মৃতপ্রায় মীরজাফরের সঙ্গে শকুনদের কথোপকথন লেখা আছে। এইসময়ে দাঁড়িয়ে কিছু কি লেখা হবে না? নিশ্চয়ই হবে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে একটা কথা আছে। আলঙ্কারিক বিচারে বলে, তটস্থ বিচার হল শ্রেষ্ঠ বিচার। নদীতে দাঁড়িয়ে তো স্রোত বোঝা যায় না, নদীর তটে দাঁড়ালে স্রোত বোঝা যায়। করোনার এই লেখাগুলোও দূরত্বে আসবে, ভালো লেখা পরেই আসে। এই যেমন দেশভাগের লেখা, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ষাটের দশকে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে লেখেন, আমি দেশভাগ, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে 'জলের উপর পানি' লিখেছি দেশভাগের ৭০ বছর পরে। আমাদের বন্ধু প্রয়াত শচিন দাস কলোনি নিয়ে লিখেছেন নব্বইয়ের শেষে। আমি পুজো সংখ্যায় একখানা লেখা লিখেছি আমাদের সংশয়, পালটে যাওয়া স্বভাব নিয়ে। খিদের পুতুল নাম। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে খিদের পুতুল ছাড়া অন্য কিছু মনে পড়েনি আর।

মধুরিমা : 'খিদের পুতুল' শুনে মনে পড়ল, পাঠক আশা করেন লেখক এমন একটা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন যা শাশ্বত অথচ প্রতিবার নতুন করে ভাবায়। এই সময়ে দাঁড়িয়ে যদি আপনাকেও কোনও এক চিরন্তন সত্য নতুন করে তুলে ধরতে হয় সেটা কোন সত্য হবে?

স্বপ্নময় : এইটা বড় কঠিন প্রশ্ন! আমি কী চিরন্তন সত্য তুলে ধরব! আমি কোন ছারপোকা! এসব তত্ত্বকথা বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই। আমি পিরানদেলোর তত্ত্বে বিশ্বাস করি। একজন মেয়েকে দেখেছিলাম বাসের জানলায় বসে বাইরে প্রকৃতি দেখছে। মুখের এইদিকটা অ্যাসিডে পোড়া, বিকৃত, বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। বাস থেকে যখন নামল, সেই মেয়েরই মুখের অন্য দিকটা দেখা গেল অপূর্ব সুন্দর। বলে না যে, সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। আমি একটা আপেল খেলাম, কামড়ানো অংশটা আড়াল করে আমি উল্টোপিঠটা আয়নায় দেখালাম, তাহলে কি

দর্পণে সমগ্রটা ধরা পড়ল? সাহিত্য আসলে সেভাবে সমাজের দর্পণও না। এগুলো বলি আমরা কারণ ছোটোবেলায় রচনা বইতে পড়েছি। আমি যখন এসব দেশপ্রেমীদের দেখি টিভিতে, কাগজে, তাদের কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা, কোনটা চাতুরি, কোনটা ছলনা, কোনটা টুপি পরানো আমি বুঝতে পারি না। এটাকে রাজনীতি বলে এবং আমরা বাধ্য হই এটাকে গণতন্ত্র বলে মেনে নিতে।

অথচ আগে তো আমরা দেখেছি চিত্তরঞ্জন দাশ ভোটে দাঁড়িয়েছেন, বিধান রায়, অজয় মুখার্জি ভোটে দাঁড়িয়েছেন। সোমনাথ লাহিড়িকেও দেখেছি। সুভাষ বসু তো দেশের কাজই করেছেন, তাহলে এঁদের তো পেয়েছি। তবে কি মেনে নিতে হবে যেদিন গেছে গিয়ে, তা আর ফিরবে না? নতুন, তরুণ নেতাও তো অনেক দেখলাম। শ্রদ্ধা তো জাগলই না। দু' তিনজন আছে যাদের উপর আশা জাগে, কিন্তু দু' তিন জনে হবে না। প্রশ্নটা ছিল সত্য, চিরন্তন সত্য। সত্য বলার স্পর্ধা আমার নেই, সত্য এরাও বলে না। তাও এদের মাঝেই এপিজে আব্দুল কালামকে পেয়েছি। ওঁকে খুব ভালো লাগত। মনমোহনকেও ভালো লাগত। ইন্দিরা গান্ধিকে আমরা ভুল বুঝতাম, কিন্তু পরে বুঝেছি তিনি অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন। আজ তোমরা যে অনলাইনে এটা করতে পারছো, তা রাজীব গান্ধির জন্যই। খুব কষ্ট করে দেশে কম্পিউটার এনেছিলেন তিনি। এই সময়টা আমার ভালো লাগছে না, কেমন যেন একটা....

মধুরিমা : আপনার সাদা কাকের চরিত্রদের যদি এই সময়ে নিয়ে আসতে হত?

স্বপ্নময় : সেগুলো তো এখন আসবে না আর। সেসবই এক একটা ট্রানজিশনের গল্প। সবাই লিখেছেন। তারাশঙ্কর লিখেছেন আরোগ্য নিকেতনে, কবিরাজদের সরিয়ে দিচ্ছে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা, সন্দীপন পাঠশালায় ইংরেজি মাস্টার মশাইদের উত্থান। আমি যেমন লিখেছিলাম চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত টোল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গল্প, নতুন ট্রানজিশনের গল্প। এখন অন্যভাবে ট্রানজিশনের গল্প আসবে, অন্য মানুষের গল্প আসবে। একই চরিত্র তো বারবার ফিরে আসবে না।

মধুরিমা : শেষ প্রশ্ন আপনাকে, এই যে দুই ভারতবর্ষ, এক ভারত পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে আরেক ভারত নিজের ছাদে পায়চারি করছে। এটা খুব পুরনো প্রশ্ন, প্রাচুর্য আর প্রয়োজনের মধ্যে একটা দূরত্ব এবং নড়বড়ে সাঁকো- একজন লেখক হিসাবে কীভাবে দেখেন?

স্বপ্নময় : দেখিই না। আমাদের মেরুকরণ রামায়ণ মহাভারতের সময় থেকেই হয়ে আছে। যখন প্রিমিটিভ সোসাইটি ছিল তখন এমন ছিল না। যখন নগর সভ্যতা এল তখন গ্রামের সঙ্গে ফারাক শুরু হল। মানুষ যখন খাদ্য অন্বেষণ করত, চাষ শেখেনি তখন মেরুকরণ ছিল না। চাষবাস শিখে যেই জমানোর পালা এল, উদ্বৃত্ত জমানো, গোলায় রাখা, পরের দিন পান্তাভাত খাওয়া এবং তারপর সেটা থেকে মদ তৈরি করা- জমানো শুরু হল মানেই প্রাচুর্য। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে সেই সাঁকোটাকে তৈরির জন্য। ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড যারা সমাজতান্ত্রিক দেশ নয় ঘোষিতভাবে সেখানে এই সাঁকোটা, এই বিভেদটা নেই। আবার চিন ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক দেশ, সেখানেও সম্ভবত বিপুল ফারাক থেকেই যাচ্ছে। তার মানে কি ডিক্টেটরশিপ প্রয়োজন? তা নয়। তবে ১৯৪০ থেকে ৭০ এর মধ্যে হাঙ্গেরি, জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়ায় মেরুকরণ কমানোর চেষ্টা হয়েছিল। এশিয়ার কিছু দেশেও চেষ্টা চলে। কিন্তু আমাদের এখানে আছে আর নেইয়ের চরম ফারাক। লাওস, কম্বোডিয়া পারেনি, জার্মানি পেরেছে, ফ্রান্স পেরেছে। কিন্তু তারা ঘোষিতভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়।